বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পারিবারিক দুর্গাপূজা

গৌতম সরকার

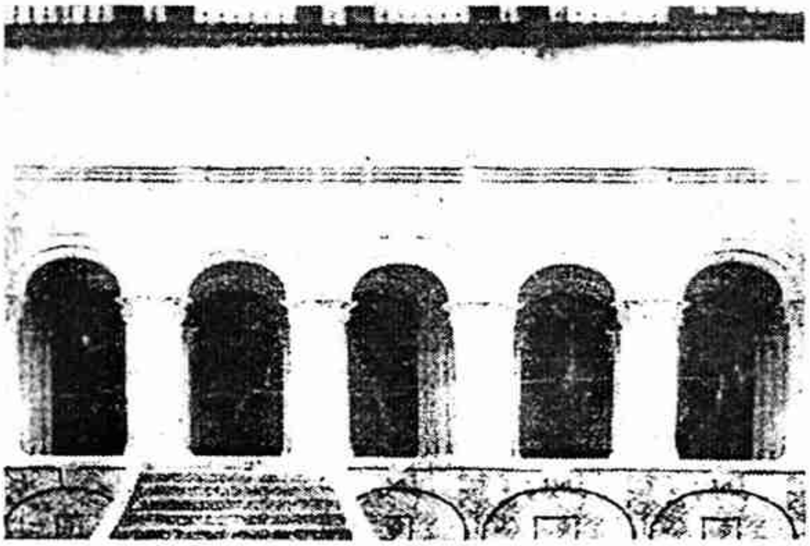

[illegible] পুজোর দালান (বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত)

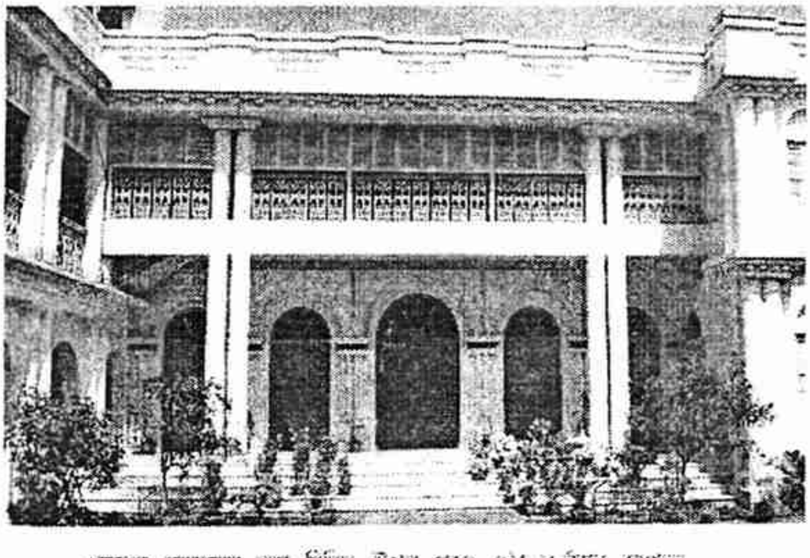

পুজোর দালানের ভগ্ন ভিটির উপর গড়ে ওঠা বর্তমান স্থাপত্য

উনিশ শতকে বাংলায় বনেদি সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার নৈহাটি কাঁটালপাড়ার সুবিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবার। এই পরিবারের সুসন্তান, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্‌গাতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ২৬ জুন ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩ আষাঢ়, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। বাবা রায়বাহাদুর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৫-১৮৮১ খ্রি.) ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর, মা দুর্গাসুন্দরী দেবী (?-১৮৭০/৭২ খ্রি.) ছিলেন পরিবারের লক্ষ্মীস্বরূপা। এই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহদেবতা হলেন শ্রীশ্রী ঁবিজয়রাধাবল্লভ জিউ, যিনি লোকমুখে ঁরাধাবল্লভ নামেই অধিক পরিচিত। ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিবারের সদস্যের বিশ্বাস যে তিনিই তাঁদের অভিভাবক এবং অন্নদাতা। তাঁরই কল্যাণে সুদীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সূত্রে নানা দেবোত্তর এবং ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করে এই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারটি তিলে তিলে স্বচ্ছল হয়েছে। বিশেষ করে যাদবচন্দ্র সরকারি উচ্চপদে চাকরি করার ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক মান, মর্যাদা, খ্যাতি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সময়ের নিরিখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায়, সন্তানদের থাকার জায়গা, তাঁদের লেখাপড়া প্রভৃতি নানা প্রয়োজনের তাগিদে বাড়ির সম্প্রসারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। এইসব কারণেই হয়তো যাদবচন্দ্র তাঁর পৈতৃক এজমালি বাড়ির দক্ষিণ সীমায় দানপ্রাপ্ত এবং কিছুটা কেনা জমিতে ১৮৪০ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুই মহলা, দোতলা প্রাসাদোপম একটি সুবিশাল ইমারত নির্মাণ করান। বাড়ির সদর

অংশের উত্তর সীমার একটি ঠাকুরদালান নির্মাণ করে সেখানে দুর্গাপুজো ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (১৫ কার্তিক, ১২৭২ ব.) যাদবচন্দ্র একটি ২৮ দফা দানপত্র অনুসারে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি পাঁচ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ওই দানপত্রের ১৪নং দফায় বাড়ির দুর্গাপুজার ব্যয়ভারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেজো ছেলে বঙ্কিমচন্দ্রকে। পুজোর যাবতীয় খরচপত্র বঙ্কিম বহন করলেও, আয়োজনের সমস্ত তদারকি করতেন যাদবচন্দ্রের মেজো ছেলে সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯ খ্রি.)। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটেতে প্রতিষ্ঠিত সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্রের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত এঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজোর খরচ সংক্রান্ত একটি নথি থেকে জানা যায়, ১২৯০ বঙ্গাব্দে (১৮৮৩ খ্রি.) অনুষ্ঠিত পুজোয় মোট ব্যয় হয়েছিল ৪০৯ টাকা ৬ আনা আধ পয়সা। এর মধ্যে প্রতিমা গড়তে খরচ—৫১ টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা, পুজোয় খরচ—৬২ টাকা ১২ আনা, নৈবেদ্য খরচ—২১ টাকা ১০ আনা ১ পয়সা, খয়রাতিতে ব্যয়—৩৩ টাকা ১২ আনা ৫ গণ্ডা, রোশনাই—৪ টাকা ১৪ আনা ১ পয়সা, উপরি খরচ—৩৬ টাকা ১৪ আনা ৩ পয়সা, ভোগ ও খাই খরচ—১৭৬ টাকা ১৪ আনা সাড়ে ৩ পয়সা, পুজোর আগে ঘরবাড়ির মেরামতিতে খরচ—২০ টাকা ১৪ আন, মোট খরচের গরমিল ছিল ৬ আনা আড়াই পয়সা মতো, বিজয়া দশমীর দিন গঙ্গায় প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নৌকা খরচ হয়েছিল ৩ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুজন তথা সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭ খ্রি.)-এর পৈতৃক নিবাস ছিল নৈহাটির অপরতীরে চুঁচুড়ার নিকটবর্তী কনকশালী গ্রামে। ভাদ্র, ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) মাসিকপত্রে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটি বিবরণ এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়—"আমাদের ওপারের রায়বাহাদুরদের বাড়ি ছিল যাত্রা-গান-মহোৎসবের মিলন মন্দির। এতদঞ্চলের একরূপ টাউন হল্। পালি পার্বণ তো ফাঁক যাবেই না, অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণির উৎকৃষ্ট কুম্ভকার শশীপাল ঠাকুর গড়িবে, উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চকণ্ঠে মা মা রবের মোহিনীশক্তি। অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণী গান। যাত্রা অঙ্গে বদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর 'কালীয়দমন' গান। দাশরথী রায়ের কথায় ছটা-ঘটা সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরে-তালে মাখামাখি গান; ফরাসডাঙ্গার জন্য মনমোহিনী ঢপ্; বর্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্তন; মধুকানের গান; এইরূপ ছোটো-বড়ো-মাঝারি কতরূপ গান প্রায়ই হইত..."[১] এই বিবরণ থেকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজোর প্রতিমা শিল্পী, চিত্রকরদের নাম, তাঁদের বাসস্থান এবং পুজোর সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।

যে ঠাকুরদালানের ভেতর একসময় অত্যন্ত ধুমধাম সহকারে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু পরবর্তী সময় সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সুবিশাল দালানটি ভেঙে পড়ে।

বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকার সচিত্র 'বঙ্কিম-স্মৃতি' সংখ্যায় প্রকাশিত এই দালানের একটি আলোকচিত্র থেকে পুরনো সেই স্থাপত্যের শিল্পরীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দক্ষিণ-মুখো, আয়তাকার এই স্থাপত্য ছিল পাঁচটি ফোকর যুক্ত (পাঁচফোকরে)। ঠাকুরদালানের চারটি বড়ো থামে খিলান দিয়ে ইউরোপীয় ধ্রুপদী পত্রাকৃতি শৈলীতে পাঁচটি ফোকর বা ফাঁক তৈরি করা হয়েছিল। ওই ফোকর বাইরে থেকে একেবারে গর্ভগৃহের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিন্যস্ত ছিল। বাইরের এবং ভেতরের থামগুলি ঘেরা ছিল সরু সরু কয়েকটি কলাগেছে থাম বা গুচ্ছবদ্ধ স্তম্ভে। দালানের ছাদের, পাঁচিলে দুই জোড়া করে চারটি স্তম্ভে রেলিং-এর ব্যবস্থা ছিল। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় ফোকরের সামনে উঠান থেকে দালানে উঠবার জন্য পাঁচ ধাপের সিঁড়ি। দালানের পাদদেশে শোভিত ছিল ধনুকাকৃতি মোটিফ। দালানের পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় প্রান্তই ছিল দোতলা। দালানের সামনে উঠানের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত দোতলা অংশটির একতলার দুটি ঘরে পুজোর নানাবিধ উপকরণ রাখা হত।

এই দালানে দুর্গাপুজোর সময় সন্ধিপুজোর একটি অসাধারণ বিবরণের কথা জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২২ খ্রি.) একটি স্মৃতিকথা থেকে। তাঁর বর্ণনায়—"রজনী গভীর। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমন সময় কোনও এক গৃহস্থের বাটীর সদর দরজা হইতে একটি লোক দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছুদূরে আসিয়া বন্দুকের একটি আওয়াজ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুষুপ্ত গ্রামবাসীদিগকে জাগরিত করিয়া চারিদিক হইতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল। ওই গৃহস্থের বাটীতেও ওইরূপ ঢাকঢোল বাজিল। মহাষ্টমী রাত্রিতে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। সেকালে সকলের বাড়িতে ঘড়ি থাকিত না। সেইজন্য এই বাটীর গৃহস্থ বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পূজা বাটীর কর্তৃপক্ষগণকে সন্ধিপূজার সময় জ্ঞাপন করাইতেন। রাত্রি তখন কত, তাহা আমার মনে নাই, কেননা, বহুকালের কথা। অনুমান দ্বিতীয় প্রহর হইবে, অষ্টমীর চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই। এই গৃহস্থের বাটীর ভিতর সর্বত্র আলোকময়। যেদিকে চাহিবে, সেইদিকেই আলোকের মালা, ছোটো ছোটো প্রদীপের আলো, সন্ধিপূজার আলো। গুটিকতক বালক ওই আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যেটি নিভিতেছিল, তৎক্ষণাৎ সেইটি জ্বালিয়ে দিতেছিল। পূজার দালানেও ওইরূপ আলোক, দশভূজার সম্মুখ হইতে উঠানে নামিবার সিঁড়ি পর্যন্ত ওইরূপ দীপের শ্রেণী। অল্পক্ষণ পরেই ঢাকঢোল বাজনা বন্ধ হইল, কেবলমাত্রদশভূজার সম্মুখে পুরোহিত ও তন্ত্রধারের মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভিতর দালানের মধ্যস্থলে সিংহ-পৃষ্ঠে অসুরমর্দিনী বাটী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তন্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশি, তাহার নিকট পুরোহিত ও তন্ত্রধার বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সন্নিকটে একটি থামে ঠেস দিয়া পৃথক আসনে এক ব্যক্তি বসিয়া। ইনি দেখিতে সাধারণ মানুষের মতো নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা,

কোনও মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কামধর্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী ইঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মের ব্রত করিয়াছিলেন ইত্যাদি।' এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম তখন প্রায় অশীতি বৎসর অতীত হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, দেহ না-ক্ষীণ, না-স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন। বাড়ির দালানে কতকগুলি প্রাচীন ভদ্রলোক মাথায় চাদর জড়াইয়া একখানি গালিচায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রতিমার পশ্চিমদিকে, অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে কতিপয় সধবা, বিধবা, প্রাচীনা গলায় অঞ্চল দিয়া বসিয়া জপ করিতেছিলেন।

"আমি একটি থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কি দেখিতেছিলাম ঠিক মনে নাই ছেলেগুলি আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাছে তাহারা আলোতে কাপড় ধরাইয়া ফেলে, বোধহয় তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে আমার পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া টানিলেন, অর্থাৎ সরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, গোঁফের চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মস্তকের অনেকগুলি কেশ পাকিয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনের পূর্ণ যৌবন বঙ্গসাহিত্যে, সমাজে তাহার একাধিপত্য। তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনও কথা নাই"[২] ১৩২০ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিবরণটি সম্ভবত ১৮৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দের কোনও একটি বছরের মহাষ্টমী রাতের কথা। উক্ত বিবরণে পূর্ণচন্দ্র, সেই রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরে জনৈক কীর্তন গায়ক বলহরি দাসের গাওয়া 'এসো এসো বঁধু, এসো' একটি গানের কথা বলেছেন। বিবরণটির শেষে তিনি লিখেছেন— "এই স্থলে মহাষ্টমীর রাত্রিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র 'এসো এসো বঁধু, এসো' গানটি প্রথম শুনিলেন। উহার বহুদিন পরে কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীকে 'বঙ্গদর্শনে' এই গান শুনাইয়াছিল।"[৩] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফাল্গুন ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৫ খ্রি.) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর দ্বাদশ সংখ্যায় 'একটি গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ওই গানটি সংযোজন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনায় আমরা যেভাবে দশভুজা দুর্গামূর্তির রূপকল্পনা প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃত অর্থে যা তাঁর স্বদেশ চেতনারই ভাবান্তর মাত্র। ধরে নেওয়া যেতে পারে স্বদেশসাধক চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই সম্ভবত সেই সমস্ত রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বিশিষ্ট বঙ্কিম গবেষক গোপালচন্দ্র রায়ের মতটি উল্লেখ করতে হয়—"১২৮১ সালের আশ্বিনে বা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বঙ্কিমচন্দ্র মালদহের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। পুজোর ছুটিতে মালদহ থেকে কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এসে বাড়ির দুর্গাপূজা দেখে 'আমার দুর্গোৎসব'

এবং পরে বন্দেমাতরম্ রচনা করেছিলেন।"[৪] কার্তিক ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন'য়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর একাদশ সংখ্যায় 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের চোখে দেবী দুর্গা তথা বঙ্গ জননীর যে রূপ কল্পনা করেছেন—"দিগ্‌পূজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"[৫] এই মূর্তি দর্শনের পর কমলাকান্তের অন্তরের ভক্তি প্রকৃত অর্থে স্বদেশভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তার কথায়—"এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি করজোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব...শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনী! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনী!"[৬] বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' যে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে 'মা যা হইবেন' সেই ভবিষ্যৎ রূপকল্পনায় মহেন্দ্রর চোখে বঙ্কিমচন্দ্র যে বর্ণনা দিয়েছেন—"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত...দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদিধরূপী গণেশ।"[৭] অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথায় বলতে গেলে—" 'আনন্দমঠ'-এর এই দশভুজা মাতৃমূর্তির বর্ণনা আর কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এর সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার বর্ণনা হুবহু এক।"[৮] 'আনন্দমঠ'-এর দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের ভিতর মাতৃরূপের যে ধ্যান বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন—

"...ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং...।"[৯]

দুর্গাপুজোয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি প্রসঙ্গে তাঁর ভাইপো শচীশচন্দ্রের (১৮৬৮-১৯৪৪ খ্রি.) বর্ণনা থেকে জানা যায়—"দুর্গোৎসবের সময় দেবী প্রতিমার পদতলে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে প্রণামে বৈচিত্র্য বা বিশেষ ভক্তি দেখি নাই। সাধারণ লোকে যেমন মাথা ঠুকিত, তিনিও সেইরূপ ঠুকিতেন। একবার সন্ধিপূজার সময় তাঁহার যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, সেরূপ মূর্তি আর কখনও দেখি নাই। দালানের এককোণে প্রতিমা হইতে দূরে, প্রাচীর অবলম্বন করিয়া একা নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হস্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ নহে, দৃষ্টিও ঠিক প্রতিমা পানে নহে। দৃষ্টি যে কোন্ দিকে, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তাঁহাকে তদবস্থায় যে দেখিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত। "বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি অন্তরে-বাহিরে প্রকাশ পাইত না।"[১০]

বঙ্কিম ভবন গবেষণাকেন্দ্রের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি পারিবারিক

চিঠি থেকে বাড়ির পুজোয় তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং নিকট পরিজনদের সঙ্গে পুজো সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নানারকম মান-অভিমানের কথা জানা যায়। এইরকম কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল—

১.

"শ্রীচরণেষু,

পূর্ণচন্দ্রের পত্রে জানিলাম, আপনি কাঠামো করিয়াছেন। আমি যেখানে আছি সেখান হইতে তিন দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর যায়। তিনদিন বিলম্বে কিছু আসিয়া যাইত না। বিশেষ এবার দুই মাস আগে কাঠামো হইয়াছে। যথেষ্ট সময় ছিল। আর কোন কোন বার আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কাঠামো করিয়াছিলেন বটে, আমিও আপনাকে অপ্রতিভ করিব না বলিয়া টাকা দিয়াছিলাম। কিন্তু এবারও সেইরূপ করা আমার বিবেচনার উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই। যে যেরূপ মনুষ্য ও যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়।...না করিয়া কেহ যদি আমার নাকে দড়ি দিয়া কাজ করাইতে চায়, তবে অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমি যে বিরক্ত হইব বলাবাহুল্য আপনিও এটুকু বুঝেন তাহা জানি, এইজন্য বুঝাইলাম।

যাই হোক, রাসের বশীভূত হইয়া জানি কোন কার্য করা উচিত নহে। যদি কলিকাতায় পূজা করিতে পারিতাম তাহা হইলে কাঁটালপাড়ার পূজার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিতাম না। যখন তাহা হইয়া উঠিল না, তখন কাঁটালপাড়ার পূজার খরচপত্র কিছু না দেওয়া বা ঐ পূজা বন্ধ করা রাগ বা কার্পণ্যের পরিচয় দিবে। অতএব আমি কাঁটালপাড়ার পূজায় ২৫০ টাকা দিব। পূর্ণচন্দ্র বোধ করি দেড়শো টাকা দিবেন। চারিশত টাকায় পূজা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

আর বৎসরও ঐরূপ বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু আপনি ৪০০ টাকায় পূজা করিতে পারেন নাই। আমি পূজার পর দিয়াছিলাম। এবার দিব না। আমরা যাহা স্বীকার করিলাম তাহাতে যদি না কুলাইতে পারেন, পূজা করিবেন না। কলিকাতায় পূজা করিলে সেখানে আমি ২৫০-৩০০ টাকায় কর্ম সমাধা করিতে পারিতাম।

...ইতি তাং ৫ ভাদ্র

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়।"[১১]

উদ্ধৃত চিঠিটি মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখেছেন। কর্মসূত্রে তখন কাঁটালপাড়ার বাইরে, ওই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায় ৫, প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি দোতলা বাড়ি কেনেন এবং সেখানেই পুজো করাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠিটি লিখেছিলেন।

"শ্রীচরণেষু,

পূজার প্রয়োজনীয় সামগ্রীপত্র যাহা চাই তাহার ফর্দ্দ করিয়া আনিবার জন্য আমি উমাচরণকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। আপনি তাহা দেন নাই। এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অন্যান্য বৎসর আপনাকে আগাম টাকা দেওয়া হইত, এ বৎসর কেন দেওয়া হইল না, জানিতে চাহিয়াছেন।

যদিই কোন কারণে পূজার টাকা আগাম দিতে অনিচ্ছুক হই এবং পূজার খরচ স্বহস্তে করিতে ইচ্ছুক হই, তজ্জন্য পূজার ফর্দ্দ আটক করা আপনার অকর্ত্তব্য। কেননা তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্গোৎসবের বিঘ্ন উপস্থিত করা হয়।

...এ বৎসর আমি দেশে আছি; পূজা আমার ইচ্ছাক্রমেই হইয়াছে আপনি পীড়িত, অতএব যতদূর পারি নিজের তত্ত্বাবধানে পূজার উদ্যোগ সম্পন্ন করাইব।

...ইতি তাং ৮ আশ্বিন।"[১২]

চিঠিটি সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা। বিগত কয়েকটি বছর বঙ্কিমচন্দ্রকে কর্মসূত্রে বাইরে থাকতে হয়েছিল। সেই কারণে বিগত বছরগুলিতে পুজোয় প্রয়োজনমতো খরচপত্র পাঠালেও নিজে হাতে কেনাকাটা করা অথবা বাড়ির পুজোতে উপস্থিত থাকার তাঁর কোনওরকম উপায় ছিল না। ১৬ এপ্রিল ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগনার (অবিভক্ত) আলিপুরে বদলি হন। সেই বছর পুজোর কেনাকাটা নিজে হাতে করবার সংকল্প করেন। 'বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়' প্রেসের ম্যানেজার উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঞ্জীবচন্দ্রের কাছ থেকে পুজোর একটি ফর্দ আনার জন্য কাঁটালপাড়ায় পাঠালে সঞ্জীবচন্দ্র ফর্দটি তাঁকে দেননি। তখন অভিমানবশত এই চিঠিটি মেজোদাদাকে লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

৩.

"শ্রীচরণেষু,

...উমাচরণ বলিয়াছেন পূজা আপনার। বস্তুত পূজা আপনারও নহে, আমারও নহে, বা অপর কাহারও নহে। পূজা পিতৃঠাকুরের। আমরা কেহ অর্থের দ্বারা, কেহ শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা, যাহার যেরূপ সাধ্য, তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

...ইতি তাং ১১ আশ্বিন

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"[১৩]

এপ্রিল, ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে কয়েকদিনের ব্যবধানে বঙ্কিমচন্দ্রের বড়োদাদা শ্যামাচরণ এবং মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে। বয়োজ্যেষ্ঠদের মৃত্যুতে এর পর থেকেই বাড়ির পুজোর সেই আয়োজনের জৌলুস অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে, উপরন্তু বাড়ির কনিষ্ঠদের পুজোর প্রতি প্রবল অনীহা বঙ্কিমচন্দ্রকে পীড়িত করে, অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে একবার

মেজোদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে জ্যোতিশ্চন্দ্র (১৮৬০-১৯৩৫ খ্রি.)-কে একটি চিঠিতে লেখেন—

৪.

"কল্যাণবরেষু,

...কৃষ্ণ পীড়িত, দুর্গোৎসবের কার্য্য করিতে পারিবেন না, বিপিন যাইবেন না, ও কিছু করিবেন না। ও তাঁহারা খরচপত্র কিছু দিবেন না। অতএব মনে করিতেছি প্রতিমা এইখানে নৌকা করিয়া আনিয়া কলিকাতার বাড়ীতে পূজা করিব। তাহার...দ্বিতীয় পত্র না পাইলে, দোমেটে করিতে দিবে না। এখনও কিছু স্থির করি নাই।

...ইতি তাং ৫ আশ্বিন, বৃঃ বার

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"[১৪]

কৃষ্ণ হলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বড়োদাদা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮২৫-৮৯ খ্রি.)-এর মেজো ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র এবং বিপিন হলেন ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্রের বড়ো ছেলে বিপিনচন্দ্র (১৮৬৩-১৯৩৯ খ্রি.)। এই চিঠিটি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং আর একটি চিঠিতে তাঁর মতামত ভাইপো জ্যোতিশ্চন্দ্রকে জানান, তা হল—

৫.

"কল্যাণবরেষু,

...এক্ষণে প্রতিমা দোমেটে করিতে দিবে। এবার সেইখানেই পূজা হইবে।

ইতি ২৩ সেপ্টে.

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"[১৫]

এই চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসনেই পুজোর আয়োজন করবার কথা জানিয়েছেন। বাড়ির পুজোয় কেবলমাত্র খরচ নির্বাহ করাই নয়, সাবেকি ঠাকুরদালানটিকে যথাযথভাবে রক্ষা করা, এর মেরামতি ইত্যাদি সকল খুঁটিনাটি বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন এবং আমৃত্যু তিনি প্রয়োজন মতো এর জন্য আর্থিক সাহায্যও করেছেন। ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণের পরেও এই দালানে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়নি। পূর্ণচন্দ্রের পঞ্চম উত্তরসূরী কাঁটালপাড়ার বাসিন্দা শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে জানা যায়, বিপিনচন্দ্রের সময়কালে, সম্ভবত ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভাগ্যবশত পুজোয় আরতি চলাকালীন প্রতিমার চুলে আগুন ধরে পুড়ে যাবার দরুণ সেই পুজোয় বিঘ্ন ঘটে। পরের বছর থেকেই এই ঐতিহ্যবাহী পুজোটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে জানা যায় যে, দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গেলে সম্ভবত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে একই দালানে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয়। ১২ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্রের মৃত্যুর পর পারিবারিক বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সেই পুজোটিও বন্ধ হয়ে যায়। পুজো বন্ধ হয়ে যাবার পর থেকেই ধীরে ধীরে এই সুবিশাল দালানবাড়িটি জীর্ণ হতে থাকে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে ক্রমশ ভাঙতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের

অপ্রাসনের এই অংশটি সরকারি নোটিশের আওতাভুক্ত হবার দরুণ চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা এই অংশটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অবশেষে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কোনও একদিন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে সেটি ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে বেশ কয়েকবছর পুজোর দালানের স্থানটি একটি ঢিবির আকারে পড়েছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে 'বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হবার পর পুজোর দালানের সেই ভগ্ন ঢিবির উপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের তত্ত্বাবধানে (বৈশাখ ১৩২২ বঙ্গাব্দে [১৯১৫ খ্রি.] 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত মূল পুজোর দালানটির আলোকচিত্র অনুযায়ী) নির্মাণ 'করা হয়েছে বর্তমান স্থাপত্যটি। যার নামকরণ হয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র সভাগৃহ।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাঁটালপাড়া, নৈহাটি)

তথ্যসূত্র :

১. 'বঙ্কিমচন্দ্র' : অক্ষয়চন্দ্র সরকার; 'বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়', ভাদ্র ১৩১৯ (পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪)।
২. "কমলাকান্তের 'এসো-এসো বঁধূ এসো!' " : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২ (পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)।
৩. ঐ " (পৃষ্ঠা ৩৯)।
৪. 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' (চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র) : গোপালচন্দ্র রায়; দে'জ পাবলিশিং (পৃষ্ঠা ২৪৩)।
৫. 'কমলাকান্ত' : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; আশ্বিন ১৪০৬ (পৃষ্ঠা ৪০)।
৬. ঐ " (পৃষ্ঠা ৪১)।
৭. 'আনন্দমঠ' : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; 'বঙ্কিম রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, শ্রাবণ ১৪১০ (পৃষ্ঠা ৬৬৭)।
৮. 'বন্দেমাতরম্' : জগদীশ ভট্টাচার্য; দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০০৬ (পৃষ্ঠা ২৯)।
৯. 'আনন্দমঠ' : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; 'বঙ্কিম রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ (পৃষ্ঠা ৬৬৪)।
১০. 'বঙ্কিম-জীবনী' : শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত; পুস্তক বিপণি; বৈশাখ ১৪১০ (পৃষ্ঠা ৩৩১)।
১১. 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি' : গৌতম সরকার : বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র; সেপ্টেম্বর ২০১৪ (পৃষ্ঠা ২৫-২৬)।
১২. ঐ " (পৃষ্ঠা ২৬-২৮)।
১৩. ঐ " (পৃষ্ঠা ২৯)।
১৪. ঐ " (পৃষ্ঠা ২৯)।
১৫. ঐ " (পৃষ্ঠা ৩০)।